অপরাজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। *প্রবাসী* মাসিকপত্রে ১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৩৮-এর আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের স্ফীতির কারণে দুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রথম বের হয়। প্রথম ভাগের প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৩২ সালে, দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশকাল মে ১৯৩২। এবারেও প্রকাশক ছিলেন সজনীকান্ত দাস, বের করা হয়েছিল রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে এবং দাম ছিল যথাক্রমে দুটাকা চার আনা ও দুটাকা। পরে *অপরাজিত* দুখণ্ডের জায়গায় এক খণ্ডে মুদ্রিত হয়, এখনও তাই হচ্ছে।

অপরাজিত সাময়িকপত্রে মুদ্রণের আগে লেখকের পরিকল্পিত নাম ছিল *আলোর সারথি*, কিন্তু *প্রবাসী*-তে ছাপানোর সময়েই শিরোনাম পরিবর্তন করে *অপরাজিত* রেখেছিলেন।

*পথের পাঁচালী*র অপু-কাহিনিরই সম্প্রসারণ *অপরাজিত*। পরে কোনো এক সময়ে অপুর সন্তান কাজলকে নিয়ে উপন্যাস রচনার ইচ্ছা তার মনে ছিল।

কিন্তু কাজলকে নিয়ে কাহিনিসৃষ্টির পূর্বেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান। তার একমাত্র পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অপু-কাহিনির তৃতীয় খণ্ড হিসেবে বহু পরে *কাজল* রচনা করেন। 'কাজল কেন লিখব, শিরোনামে একটি রচনা বিভূতিভূষণ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে *কথাসাহিত্য* পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন এবং ঐ কাগজেই ১৩৫৭-র পৌষ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভেবে *কাজল* প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। এ থেকে তার যে অভিপ্রায় ধরা পরে পিতার সেই অতৃপ্ত বাসনা পুত্র চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

হার না মানার উপন্যাস *অপরাজিত*

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হলো। প্রথম অংশটা আনন্দ মিশ্রিত–এমনকি মায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রথম যখন সে তেলি বাড়ির তারের খবরে জানল, তখন প্রথমটা তার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস, একটা বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস–অতি অল্পক্ষণের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে।

কী নিষ্ঠুর মনে হয়, না? মায়ের মৃত্যুতে অপুর মনের একটা অংশ সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ার আনন্দে উল্লসিত। যে স্বাধীনতার স্বাদ সে দীর্ঘদিন যাবৎ পেতে চেয়েছিল, সে স্বাধীনতার অবারিত দুয়ার তার সামনে খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তাৎক্ষণিকভাবে অপুর চরিত্র এখান থেকে হয়তো খানিকটা অনুমান করা যায়; তবে পরমুহূর্তেই মায়ের জন্য অপুর আবেগ দেখে হতে হয় বিভ্রান্ত।

–উলা স্টেশনে নেমে হাঁটতে শুরু করল। এই প্রথম এপথে সে যাচ্ছে–যেদিন মা নেই! গ্রামে ঢোকার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময় হেঁটে পার হওয়া যায়–তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করেছে! এই সেদিন বাড়ি থেকে গেছে, মা তখনও ছিল। ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ি ওরা নিয়ে গেছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করে বসে রইল। উঠানের বাইরে আগরের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়তেই অপু শিউরে উঠল–সে বুঝেছে–মাকে যারা সৎকার করতে গিয়েছিল, দাহ করার পর কাল তারা এখানে আগুন ছুঁয়ে নিমপাতা খেয়ে শুদ্ধ হয়েছে–প্রথাটা অপু জানে। মা মারা গেছে। এখনও অপুর বিশ্বাস হয়নি। একুশ বছরের বন্ধন মন এক মুহূর্তে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি। কিন্তু পোড়া খড়গুলোতে নগ্ন-নিষ্ঠুর-রূঢ় সত্যটা, মা নাই! মা নাই! বিকেলের রূপট কেমন! নির্জন, নিরালা, কোনো দিকে কেউ নেই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা। অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলোর দিকে চেয়ে রইল...।

অপরাজিত বিভূতিভূষণের অনবদ্য এক সৃষ্টি। অনেক সময়ই একটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বকে ম্লান বা জনপ্রিয়তার বিচারে

ছাপিয়ে যেতে পারে না। তবে *অপরাজিত* এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। *পথের পাঁচালী*-র পরের পর্ব হিসেবে প্রকাশিত হওয়া এই উপন্যাসে বিভূতি তার পাঠকদের চোখে অপুর কৌতূহল, বিস্ময় ও বোধশক্তির মিথস্ক্রিয়া তার আশ্চর্য হবার যে বোধশক্তি, যা কিনা সাধারণকেও দীপ্তিমান করে তোলে, এ ছাড়া অজানার প্রতি তার যে দুর্বার আকর্ষণ, তা ফুটিয়ে তুলতে পুরোপুরি সফল হয়েছেন।

নিশ্চিন্দপুর থেকে চলে যাওয়ার পর অপুর কাছে তার গ্রাম্য জীবনকে সীমাবদ্ধ লাগতে থাকে। অপু স্কুলে পড়তে চায়। ভর্তি হয় গ্রাম্য এক বিদ্যালয়ে। রোজ দুই ক্রোশ পথ হেঁটে পড়তে যেত সে। তার এই হাঁটাপথেরও ছিল অন্যরকম কিছু গল্প। এই পথের কথা অপু পরে আর কখনও ভুলতে পারেনি। গ্রাম্য বালক অপু সেখান থেকে বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হয় মহকুমার হাইস্কুলে।

মহকুমার বোর্ডিং স্কুলে অপুর সামনে উন্মোচিত হয় নতুন এক জগত। সেখানে সে সারাদিন তার অজানা সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে, খানিকটা বুভুক্ষুর মতো। অপুর দিগন্ত ক্রমেই বাড়তে থাকে। স্কুলের লাইব্রেরিতে বই দেখে সে দিশেহারা হয়ে যায়। সারা বিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে সে জানতে চায়। যেতে চায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে।

তবে এখানেও মাঝেমধ্যে তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। নির্জন বিকেলগুলোতে তার বাবার চেহারা, তার বোনের সঙ্গে তার যত দুষ্টুমির কথা সে কল্পনায় দেখে। তার মায়ের চেহারা না দেখে সে থাকতে পারে না।

কয়েক বছর সেখানে পড়ার পর অপুর হাইস্কুলের পাট চুকায়। তখন অপুর প্রথম যৌবন শুরু। তার সবসময় মনে হয় কী যেন একটা ঘটবে, তাই সে আশায় আশায় থাকে। হয়তো তা অজানার ডাক, যার কাছে বাদবাকি সবকিছুই তুচ্ছ।

মহকুমার পরে অপু কলেজে পড়ার জন্য যায় কলকাতায়। রিপন কলেজে ভর্তি হয়ে সে শুরু করে কলেজের পড়াশোনা। এই কলকাতা থেকেই শুরু হয় অপুর আসল জীবনযুদ্ধ।

অপুর জীবনের দিগন্ত ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। এ সময়ে তার অনেক নতুন নতুন বন্ধু হয়। জানকী, মন্মথ, বিশেষভাবে অনিল ও প্রণব। প্রণবের উৎসাহেই সে আবার নতুন করে বিভিন্ন বিষয়ে নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু করে। আর অনিল ছিল অনেকটা অপুর মতোই। প্রকৃতিকে তারা দুজনই ভালোবাসত। কিন্তু শহরের গতিময়তাও ছিল তাদের মাঝে। এ ছিল এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতদিন পর্যন্ত অপু তার নিজের সঙ্গে মেলে, এমন কাউকে পায়নি। অনিলকে পেয়ে অপুর মনে হয়েছিল, সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া কেউ নয়।

এ সময় অপুর ভীষণ অর্থকষ্ট শুরু। টিউশন পড়িয়ে নিজেকে চালাতে হতো তার। নিজেদের অবস্থান নিয়ে মাঝেমধ্যে দুঃখ হতো অপুর। শহরের প্রাণহীন

মানুষগুলোকে পড়াতে গিয়ে তার মনে পড়ত দেওয়ানপুরের নির্মলার কথা। তার আফসোস হতো, নির্মলার মতো মমতাময়ীকে সে চিনতে গিয়েও চেনেনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে, এখন আর নতুন করে চিনেই বা কী লাভ?

হঠাৎ করে টিউশন চলে গেলে অপু পড়ে যায় অথৈ জলে। খাওয়া-খাদ্যের ঠিকঠিকানা নেই, কী করবে, তা বুঝতে পারত না সে। প্রতিদিন গিয়ে বিজ্ঞাপন ঘাঁটত ছেলে পড়ানোর, যদি দুয়েকটা টিউশন পাওয়া যায়–এই আশায়। বাড়িওয়ালার নোটিসে মেস ছেড়ে গিয়ে ওঠে ভাড়াবাড়িতে। টাকার অভাবে ভাতের বদলে ছাতু খেয়ে দিনকাল চালাতে থাকে অপু। মাঝেমধ্যে চিন্তা করে, সে মনসাপোতার বাড়িতে ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু তাও পারে না, আবার সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভেতরে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেই তার শরীরের প্রত্যেকটা রক্তবিন্দু বিদ্রোহ করে।

সবাই বিয়ে করার কথা বললেও অপু আর বিয়ে করেনি। একজীবনে অনেকের ভালোবাসাই পেয়েছিল অপূর্ব। লীলা, নির্মলা, রানুদি, লীলাদি–এমন অনেকে আত্মীয় বা বংশগত না হয়েও পরম আত্মীয় হিসেবে জীবনে এসেছিল অপূর্বের। অপর্ণার আগমনেও অপুর মাতৃস্নেহ, ভালোবাসা–সবকিছুর অভাব দূর হয়েছিল। চাকরি, ছেলে পড়িয়ে উপার্জন করার পরও অপুর জীবনে অভাব লেগেই থাকত। অবশ্য শেষের দিকে বই লিখে ভালো নাম-ডাক আর অর্থ উপার্জনও করেছিল অপু। শত অভাবে থেকেও সে বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখেছিল। সেসবের স্বাদ সে নিয়েছিল পরম আনন্দে।

স্ত্রী অপর্ণার গহনা বিক্রি করে প্রথম বই নিজের খরচে প্রকাশ করেছিল অপু। মায়ের দীর্ঘদিনের অনুরোধ ও শেষ ইচ্ছেতে নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগানটাও অপু কিনেছিল সতুর কাছ থেকে।

মা, বাবা, দিদি, স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও লীলাদি, রানুদি, জেঠিমা, মেজ ঠাকুরানসহ অনেকের আদর-স্নেহ-ভালোবাসায় অপুর মনে ভক্তি জেগেছিল।

নিশ্চিন্দিপুরের বন্ধুদের থেকে শুরু করে বোর্ডিং স্কুলের, কলকাতার বিভিন্ন মেসের, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে থেকে জীবনের নানা রূপ অপু দেখেছে এই সমাজজীবনের। অভাবে থাকার পরও কবিরাজ বন্ধু ও বন্ধুপত্নী থেকে যে স্নেহ পেয়েছিল অপু, ঠিক বিপরীতও ঘটেছিল অভাবে পড়ে সুবিধা নেওয়ার ধান্দা করা বন্ধু হরেন থেকে। আবার কলেজের বন্ধুরা মিলে টাকা তুলে অপুর বকেয়া পরিশোধ করেছিল; সেটাও সারা জীবন মনে রাখবে অপু।

নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী, কাশী থেকে রায়চৌধুরীর বাড়ি, সেখান থেকে মনসাপোতা, সেখান থেকে কলকাতা, আবার কলকাতা থেকে নিশ্চিন্দিপুর। জীবনের স্রোতে চলমান আপুদের সংসার কোথাও স্থায়ী হয়নি। অপু পড়াশোনা

আর জীবিকার তাগিদে আরও থেকেছে কয়েক জায়গায়। তবু এর মধ্যে জীবনসংসারে নানা সুখ, দুঃখ ও বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে জীবনরেখা।

হঠাৎ অনিল এক অসুখে পড়ে মারা যায়। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে অপু মুষড়ে পড়ে।

কিছুদিন পর অপুর দেখা হয় তার বাল্যকালের বান্ধবী লীলার সঙ্গে। কিছুটা অবাক হয় সে, বালিকা লীলার সঙ্গে এখনকার লীলার কোনো মিল দেখতে না পেয়ে। হঠাৎ সে উপলব্ধি করে, লীলা তার মনের ভেতরের এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। সে জায়গায় অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই।

সময় গড়াতে থাকে। অপুর মা মারা যায়। অর্থাভাবে অপুকে একসময় তার পড়াশোনা ছাড়তে হয়। নানাভাবে নানাদিক দিয়ে অপু প্রতারিত হয়। মাঝেমধ্যে তার চোখে জল আসে। খবরের কাগজে চাকরি হয় অপুর। পুরোনো বন্ধু প্রণবের সঙ্গে আবার যোগাযোগ ঘটে। ঘটনার পাকে পড়ে প্রণবের মামাতো বোনের সঙ্গে অপুর বিয়ে হয়। অপুর জীবনে অপর্ণার আগমনে নতুন করে সংসারী হওয়ার বাসনা হয়েছিল। সংসারও করেছিল দুজন মনের মতো করে।

রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে দূরসম্পর্কের আত্মীয় ভবতারণ চক্রবর্তীর গ্রামের বাড়ি মনসাপোতাতে গিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন মা ও ছেলে। অপু গ্রামের দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে পড়াশোনা করেছে। সেখান থেকে প্রথম হয়ে মাসিক পাঁচ টাকা স্কলারশিপ পেয়ে দেওয়ানপুর মহকুমার বোডিং স্কুলে পড়াশোনা করেছে। মাসিক খরচ সামলাতে না পেরে বোডিং খরচ বকেয়া পড়েছে। হেডমাস্টারের সহযোগিতায় ডেপুটির বাড়িতে লজিং মাস্টার থেকে পড়াশোনা চালিয়েছে। সেখানে গৃহকর্ত্রীর মমতা-স্নেহ আর আদর মায়ের কষ্ট ভুলিয়েছে। নির্মলার পরমযত্ন আর ভালোবাসা সারা জীবন মনে রাখার মতো সাক্ষী হয়েছে।

সেখান থেকে পাস করে অপু কলকাতায় গিয়েছে। কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলকাতা পড়াশোনা করতে গিয়ে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে অপুকে। ক্ষুধার জ্বালা, থাকার অসুবিধা, পড়ার কষ্ট, আপন মানুষজনদের নীরব ব্যবহার, বকেয়া পড়ায় খাবারের কষ্ট, ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যার আরতি শেষ হওয়ার পর রাতের ফ্রি খাবারের অপেক্ষা, কষ্ট পেলেও কারও কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা না প্রকাশ করা, নিজে কষ্টে থেকেও অনেককে সহায়তা করা, ইম্পিরিয়ালসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বসে বসে বই পড়া আর জল-মুড়ি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা, মাকে কথা দেওয়া–একটা চাকরি হলেই কলকাতায় নিয়ে

যাওয়া, শহর ঘুরিয়ে দেখা ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় কলকাতার কঠিন জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছে অপুকে।

দুর্গাদি ও বাবা মারা যাওয়ার পর চিকিৎসা আর যত্নের অভাবে মায়ের মৃত্যুও দেখতে হয়েছে অপুকে। আইএ পাস করে চাকরি করা অবস্থায় বন্ধু প্রণবের অনুরোধে তার মামার বাড়িতে মামাতো বোনের বিয়েতে গিয়ে নিজেরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে অপুকে।

ভালো অবস্থাসম্পন্ন বাড়ির মেয়ে হয়েও দরিদ্র অপুর সংসারে নিজেকে ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছিল অপর্ণা। মনসাপোতা গ্রামের বাড়িতে খড়ের ঘরে ও কলকাতার ভাড়া করা ছোট্ট বাসায়ও অপুকে নিয়ে স্বর্গীয় সুখের সংসার সাজিয়েছিল দুজনে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে একমাত্র সন্তান কাজল হওয়ার পর মৃত্যু হয় অপর্ণার। অপুকে আবার আপনজন চলে যাওয়ার শোক পেতে হয়েছিল। ভবঘুরে আর ব্যাচেলর-জীবনে অপর্ণা এসেছিল অপুর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে। সেটাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

সময় ক্রমেই আরও গড়িয়ে যেতে থাকে। সংসারজীবনে অনভ্যস্ত অপু অপর্ণার সঙ্গে সুখের সংসার গড়ে তোলে। তাদের দুজনের ভালোবাসায় অভিমান থাকে, হাসিঠাট্টা থাকে। সেখানে থাকে ছেলেমানুষি। অপর্ণা যেন আসে অপুর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে। তবে সুখ বেশিদিন টেকেনি অপুর কপালে।

কাজলের জীবনটা সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয়েছে। জন্মের পর মা মারা যাওয়া, দিদার আদরে বড়ো হওয়া, দিদার হঠাৎ মৃত্যুতে জীবনে কালো মেঘ চলে আসা, মা বলতে কী সেটা না বোঝা, মামার বাড়িতে সারাক্ষণ দাদুর শাসন, মামিমাদের খারাপ ব্যবহার, ছাদের নির্জন ঘরে ভয়ে ভয়ে একা থাকা, অসুস্থ বা জ্বর হলে অনাদরে পড়ে থাকা, মা-বাবাহীন শিশুকে বাড়ির কর্মরত মুহুরির পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করা, যা সত্যিই বেদনাদায়ক। বাবা নামক ব্যক্তির সঙ্গে কাজলের মামার বাড়িতে কমই দেখা হয়েছে। কিন্তু বাবার অবহেলার কারণে উঠতে-বসতে শুনতে হয়েছে তাদের ঘাড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করার মতো কথাও। বালক বয়সে এসব কথা ও আচরণগুলো ধারালো তিরের মতো বিদ্ধ হয়েছে তার কমল হৃদয়ে। কিন্তু কাজল জানত না, কার কাছে সে এগুলোর অভিযোগ দেবে। কেই-বা তাকে এসব থেকে রক্ষা করবে। একটু বয়স বাড়ার পর কাজল বাবার অপেক্ষায় থাকত, বাবা এলে তার সঙ্গে চলে যেতে চাইত। একসময় অপুও তাকে এই অনাদর আর অবহেলার জায়গা থেকে নিয়ে যায় কলকাতায়। অপুর পুরো জীবনে সরল আর বিশ্বস্ত বন্ধু মনে হয় কাজলকে।

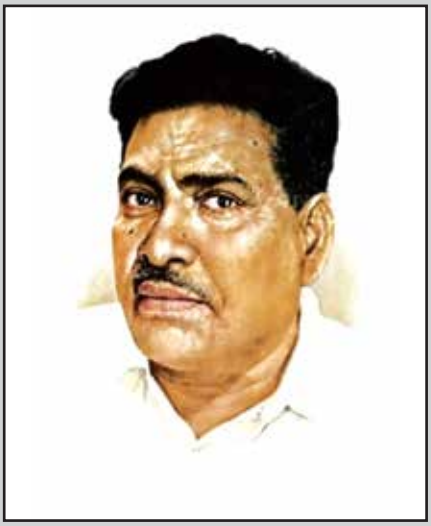

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনায় মুরারীপুর গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক বাড়ি ঝারখন্ডের ব্যারাকপুরে।

তার বাবার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। তাদের দুজনের ৫জন সন্তান ছিল, যার মধ্যে বিভূতিভূষণই ছিলেন সবচে বড়ো।

ছোটোবেলা থেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে ভীষণ মনোযোগী ছিলেন। তার পড়াশোনা বেশ ভালোই চলতে থাকে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মাধ্যমে তিনি একের পর এক ক্লাস উত্তীর্ণও হতে থাকেন কিন্তু যখন তিনি অষ্টম শ্রেণিতে ওঠেন, তখন হঠাৎই শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

বাবার এইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া, ছোট্ট বিভূতির মনে ভীষণ কষ্ট দেয়। আর কষ্ট হওয়াটাই যে স্বাভাবিক, কারণ ছোটোবেলায় তার বাবাই তাকে পড়াশোনা শেখানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন আদর, আবদার পূরণ করতেন।

১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় তার প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশ পায় এবং এই গল্পের মাধ্যমেই বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। যখন তিনি ভাগলপুরে থাকতেন, তখন তিনি *পথের পাঁচালী* লেখা শুরু করেন। এই অনবদ্য উপন্যাসটা লেখা শেষ হয় ১৯২৮ সালে।